রাষ্ট্রপতির সংলাপ, অনুসন্ধান কমিটি ও নির্বাচন কমিশনে পুনর্নিয়োগ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৬ জানুয়ারি ২০১২)

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে শেষ হবে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ২২ ডিসেম্বর থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। সংলাপ শেষে রাষ্ট্রপতি কমিশনে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন। সম্ভাব্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নাম বাছাইয়ের লক্ষ্যে একটি সার্চ বা অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি অনুসন্ধান কমিটিতে প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি ও হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে উল্লেখিত পাঁচ সদস্যের বাইরেও উপযুক্ত ব্যক্তিদের কমিটিতে যুক্ত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। গত ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপ শেষে ওই দিন সন্ধায়ই তিনি অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আইন বা প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করেন (*প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারি ২০১২)। গত ২১ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রিপরিষদ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে, যা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

রাষ্ট্রপতির সংলাপ, তাঁর সুপারিশ, অনুসন্ধান কমিটি গঠন ও নির্বাচন কমিশনে পুনর্নিয়োগ বিষয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এরই মধ্য অনেক নাগরিকের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। এসব প্রশ্ন উত্থাপনই আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রপতির সংলাপ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বস্তুত তিনি জাতির অভিবাবক এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁর ভূমিকা একান্ত কাম্য। তাই আমরা অনেকেই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সংলাপের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলাম দেখে যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সংলাপে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল। আশা করেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের বাধাগুলি দূর এবং আমাদের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হওয়ার পথ সুগম হবে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে আজ বাধা শুধু নির্বাচন কমিশনের সম্ভাব্য নিরপেক্ষতাহীনতাই নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি ও রাজনৈতিক দলের অসদাচারণও এক্ষেত্রে একটি পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা। বস্তুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুর সমাধান ছাড়া নির্বাচনই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে। তাই আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, সংলাপের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি সব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সার্বিক সমঝোতায় পৌঁছার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

রাষ্ট্রপতির ডাকা সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাবও দেয়। যেমন, সংলাপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি তোলে। আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের শরিক দলগুলো অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনপ্রবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আমরা আশা করেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি দলমত নির্বিশেষে সকলের মতামত বিবেচনায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর বিষয়ে সমঝোতার উদ্যোগ নেবেন। অনেক নাগরিক অবশ্য আশায় বুক বেঁধে ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বক্তব্য শুনে যে রাষ্ট্রপতি চাইলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আলোচনায় বসতে সম্মত (*প্রথম আলো*, ১৩ জানুয়ারি ২০১২)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো অজ্ঞাত কারণে রাষ্ট্রপতি সে সুযোগটি গ্রহণ করলেন না। বরং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ও অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সুপারিশের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সে সুপারিশও সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবিত আইনটি অবশ্য বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।

নীতিগতভাবে সমর্থন করলেও, রাষ্ট্রপতির শুধুমাত্র আইনপ্রণয়নের প্রস্তাব, অনুসন্ধান কমিটি গঠন যার অংশ, অনেককে হতাশ করেছে। কেউ কেউ এটিকে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতির এত কাঠখড় পুড়িয়ে সংলাপ করার প্রয়োজন ছিলো না – আমাদের সংবিধানেই এমন নির্দেশনা রয়েছে।

আমাদের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে: 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।' অর্থাৎ এ বিষয়ে আইনপ্রণয়ন একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গত ৪০ বছরে কোনো সরকারই তা কার্যকর করেনি, যদিও অতীতের নির্বাচিত সব সরকারই সংবিধান সংরক্ষণ করার শপথ নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছে।

অনুসন্ধান কমিটির ধারণাটিও নতুন নয়। বহুদিন থেকেই অনেক ব্যক্তি এমন প্রস্তাব করে আসছে। 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' ২০০৪ সালে নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে প্রথম অনুসন্ধান কমিটির প্রস্তাব করে। গত বছর নির্বাচন কমিশনও এধরনের একটি প্রস্তাব রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সামনে উত্থাপন করে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে অংশগ্রহণকালে আওয়ামী লীগ কমিশনের এ প্রস্তাব, পরে মতামত দেওয়ার কথা বলে, সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যায়। বিএনপি অবশ্য কমিশনের সঙ্গে সংলাপে বসতেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

রাষ্ট্রপতির সংলাপ সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৩৯। এতগুলো দলের মধ্যে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনি ২৩টি দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন? এমনকি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব দলকেও সংলাপে ডাকা হয়নি।

অনুসন্ধান কমিটি

রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবটি প্রেরণের নয় দিনের মাথায় মন্ত্রিপরিষদ গত ২১ জানুয়ারি চার সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাবসম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিটির সদস্যগণ হবেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগ ও হাইকোর্টের একজন করে বিচারপতি, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আপিল বিভাগের বিচারপতি কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি নিজ কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ১০ কার্য দিবসের মধ্যে কমিশনের প্রত্যেক শূন্য পদের জন্য দুইজন করে নাম রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব করবে।

সর্বশেষ ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অনুসন্ধান কমিটির সদস্যগণ হলেন: আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আহমেদ আতাউল হাকিম এবং সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি আহমেদুল হক চৌধুরী।

প্রস্তাবিত অনুসন্ধান কমিটি নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকের মনে অনেক গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হলেও, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়েই অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হলো। নির্বাচন কমিশনের অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে কমিশন গঠনের প্রস্তাবে অবশ্য জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে বাছাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই অনেকের মতে কমিশনের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি ছিলো অপেক্ষাকৃত উত্তম, কারণ এতে সরকারি ও বিরোধী দলের সম্পৃক্ততা, এমনকি একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছার সুযোগও সৃষ্টি হতো।

আরেকটি দিক থেকেও নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবটি উত্তম। এতে বিদায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুসন্ধান কমিটির আহবায়ক করার এবং কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কমিশনে যথার্থ ব্যক্তি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ 'স্বার্থ' জড়িত থাকার কথা। কারণ কমিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং প্রতিষ্ঠানটির ওপর 'মালিকানাবোধ' সৃষ্টির ফলে তিনি সাধারণত চাইবেন না বিতর্কিত ব্যক্তিরা নিয়োগ পেয়ে এর সুনাম নষ্ট করে – এতে তাঁর 'লিগেসি'র প্রশ্ন জড়িত। এছাড়াও কমিশনের সচিবালয়ের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদকে কেন সাচিবিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হলো তা অনেকেরই বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয়ত, অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়েই যদি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হবে, তাহলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এতে অন্তর্ভুক্ত হবেন না কেন? সংলাপের ভিত্তিতে 'উপযুক্ত' ব্যক্তিদের কমিটিতে রাখার সুপারিশ ত রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবেই ছিলো। সরকার তাহলে শুধু বিরোধী দলই নয় রাষ্ট্রপতির মতামতকেও অগ্রাহ্য করল!

তৃতীয়ত, আইন/অধ্যাদেশের পরিবর্তে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেন কমিটি গঠন? সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের চেতনার আলোকে আইন/প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত করে দেওয়া যেত। একইসঙ্গে নির্ধারিত করে দেওয়া যেত অনুসন্ধান কমিটির কার্যপদ্ধতি। আর আইনপ্রণয়নের লক্ষ্যে সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এতে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হতো। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, এমনকি সার্বিক বিষয়ে একটি বহুদলীয় সমঝোতা সৃষ্টির পথও হয়ত বা উন্মোচিত হতে পারত, কারণ শোনা যায় যে, বিএনপি সংসদের আগামী অধিবেশনে অংশ নেবে। সময়ের সল্পতার বিবেচনায় সংসদ অধিবেশনও ২৫ জানুয়ারির পরিবর্তে কয়েকদিন এগিয়ে আনা যেত।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতির সুস্পষ্ট প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানকে অনুসন্ধান কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শৃঙ্খলিত – নখ ও দন্তহীন বাঘে পরিণত – করার সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে তার সমালোচনাই কি এর কারণ? সরকার কি তাহলে একজন অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার 'ঝুঁকি' এড়াতে চেয়েছে? সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এত সময়-শ্রম ব্যয়ের পর এভাবে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের সামিল বলেই অনেকের ধারণা।

পঞ্চমত, চারজনের অনুসন্ধান কমিটির মধ্যে দুইজন বিচারপতি রাখা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। ড. শাহদীন মালিক অনুসন্ধান কমিটির বিচারক রাখারই বিপক্ষে (*প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি, ২০১২)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের আপত্তির একটি বড় কারণ হলো, এর সঙ্গে বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততা। একই যুক্তি প্রযোজ্য হওয়া উচিত বিচারকদের অন্য কাজে ব্যবহার করার বিষয়েও। তাই আমরা মনে করি যে, বিচারকদেরকে অনুসন্ধান কমিটি থেকে দূরে রাখাই ছিল যুক্তিসঙ্গত।

সরকারি প্রজ্ঞাপনে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হলেই কেউ নিরপেক্ষ ও সাধু হয়ে যান না। বস্তুত আমাদের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট প্রভাবের কারণে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই এখন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। তাই চার সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই জনমনে প্রশ্ন উঠতে পারে। ফলে অনেক নাগরিকেরই আশঙ্কা যে অনুসন্ধান কমিটি গঠন নিতান্তই একটি আই ওয়াশে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়োগ প্রদান থেকে উত্তম নাও হতে পারে। আর অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সৎ, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা না গেলে, এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ রাজনীতিবিদদের দলীয় অবস্থান সকলেরই জানা, তাই তাঁদের দলপ্রীতির তুলনায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দেয়ালের অভ্যন্তরে অবস্থান করা ব্যক্তিদের দলীয় আনুগত্য অনেক বেশি ভয়াবহ।

এছাড়াও অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সরকারের আমলে মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অনুসন্ধান বা সার্চ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তদের অনেকের বিরুদ্ধেই দলপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। উপরন্তু অনুসন্ধান

কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তড়িঘড়ি করে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই বরখাস্ত করা একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ ছিলো – যে অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সুবাদে অনেকেরই জানা ছিলো। গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের বিষয়েও অনেক বিতর্ক রয়েছে। তাই অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

বর্তমান কমিশনের পুনর্নিয়োগ

গণমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রপতি সংলাপে অংশগ্রহণকারী কিছু রাজনৈতিক দল বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. শামসুল হুদাকে পুনর্নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করেছে। আবার কিছু দল পুরো কমিশনকেই রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। প্রস্তাব দুইটি নিয়ে বর্তমানে অনেক কানাঘুষা চলছে। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. হুদাকে স্বপদে বহাল রেখেই কমিশন পুনর্গঠিত হচ্ছে এ মর্মে সংবাদপত্রে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে (*সমকাল*, ১৩ জানুয়ারি ২০১২)

অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে বর্তমান কমিশন অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিশন সফলতা ও নিরপেক্ষতার একটি উচুঁ মানদণ্ড স্থাপন এবং দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। বস্তুত, অনেকের মতে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান কমিশন থেকে অধিক করিৎকর্মা ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন পাওয়া হবে প্রায় অসম্ভব। তবে প্রস্তাব দুইটি কিছু গুরুতর সাংবিধানিক প্রশ্নের উদ্রেক করে।

সংলাপে প্রদত্ত পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবের পর এর আইনি বৈধতা নিয়ে একটি বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ দাবি করছেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য দুইজন নির্বাচন কমিশনার জনাব ছহুল হোসেন ও ব্রিগেডিয়ার (অব.) শাখাওয়াত হোসেনকে পুনর্নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো সংবিধানিক বাধা নেই। পক্ষান্তরে অন্য একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এমন সিদ্ধান্ত হবে অর্বাচীন ও সংবিধানের লঙ্ঘন।

আমাদের সংবিধানের ১১৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার-গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।'

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, একজন নির্বাচন কমিশনারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান ব্যতীত কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের পুনর্নিয়োগ হবে অসাংবিধানিক। কারণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যিনি একবার নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন, তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের অযোগ্য। তেমনিভাবে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে যিনি/যাঁরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত নন, তিনি/তাঁরাও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের অযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্রের কর্মের সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১৫২ অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্রের কর্ম' অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম।' তবে সংবিধানের ১৪৭(৩)(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনার ও সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যগণ লাভজনক পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারি বলে গণ্য হবেন না। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিল থেকে বেতন-ভাতা পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনার ও সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত নন। ফলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে সাংবিধানিক কোনো বাধা নেই বলেই মনে হয়, যদিও সংবিধানের ১১৮(৩) অনুযায়ী কমিশনারদের মধ্যে যিনি/যাঁরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত নন, তাঁর/তাঁদের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। তবে এটিই শেষ কথা নয়।

বিচারপতি এমএ আজিজের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ-সংক্রান্ত মামলায় [*এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস ও অন্যান্য বনাম বিচারপতি এমএ আজিজ ও অন্যান্য* ৬০ডিএলআর(২০০৮)] বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এসএম জিয়াউল করিম সমন্নয়ে গঠিত ডিবিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪৭(৩)(৪) অনুচ্ছেদের ভিন্ন ব্যখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, যাঁরা রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিল থেকে পারিশ্রমিক পান তাঁরা অবশ্যই প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত।

রায়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রের কর্ম–পারিশ্রমিক–সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদ বর্ণিত পদ অধিকারী ব্যক্তিগণ নির্বাহী সরকারের অন্তর্গত নহেন তবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত এবং তাঁহারা ঐরূপ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন বিধায় রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিল (Consolidated Fund) হইতে তাঁহাদের কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক (emoluments) পাইয়া থাকেন। যেহেতু প্রজাতন্ত্রের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ অবস্থান হইতে কর্ম সম্পাদন করেন সেহেতু তাঁহারা সংযুক্ত তহবিল হইতে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রজাতন্ত্রের জন্য কর্ম সম্পাদন না করিলে সংযুক্ত তহবিল হইতে কোন পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী হইতেন না।'

অর্থাৎ সংবিধানের ১৪৭(৩)(৪) অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রমি বিধান সত্ত্বেও, আদালতের মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনই তাঁদের জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্ম। তাই একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ প্রজাতন্ত্রের সকল পদে নিয়োগের অযোগ্য হবেন। তেমনিভাবে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে একবার দায়িত্ব পালনের পর কোনো ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়া নির্বাচন কমিশনারসহ প্রজাতন্ত্রের অন্য সকল পদে নিয়োগের অযোগ্য হবেন।

আদালতের ভাষায়: 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভ–প্রতিবন্ধকতা এবং অযোগ্যতা–১১৮ অনুচ্ছেদের ৩ উপ-অনুচ্ছেদে 'অন্য কেনোভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না' বা 'shall not be otherwise eligible for appointment in the Service of the Republic' বাক্যগুলির কারণে নির্বাচন কমিশনার পদের মেয়াদান্তে বা উক্ত পদে থাকাকালীন সময় তিনি প্রজাতন্ত্রের লাভজনক বা অলাভজনক, সর্ব প্রকার চাকুরী বা পদের অযোগ্য হইবেন। একজন সচিব চাকুরীকালীন সময়েও নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাইতে পারেন কিন্তু পুনরায় সচিব পদসহ প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন প্রকার চাকুরী বা পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন না। ইহা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা ও পরিপূর্ণ অযোগ্যতা। ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম সংবিধানের মর্মার্থ বা মূলবাণীকে (spirit of the Constitution) ধ্বংস করিবে।'

সংবিধানের মর্মার্থ বা মূলবাণী হলো যে, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। আর এ লক্ষ্যেই, সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের ভাষায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন এমন ব্যক্তি পুনরায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হবেন এবং নির্বাচন কমিশনার ছিলেন এমন ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়া অন্যকোনোভাবে প্রজাতন্ত্রের নিয়োগের অযোগ্য হবেন [*মাহমুদুল ইসলাম, কনস্টিটিউশানাল ল অব বাংলাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, (মল্লিক ব্রদার্স, ২০০৮), পৃ. ৬৮৮]। অর্থাৎ আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ একজন নির্বাচন কমিশনার ছাড়া – যাঁকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে – প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য কমিশনারদের মেয়াদ এক টার্মের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এর কারণ হলো কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ভবিষ্যতে পুনর্নিয়োগের আশায় যেন তাঁরা প্রলুব্ধ না হয়ে স্বাধীন ও নির্মোহভাবে কাজ করতে সক্ষম হন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য দুই কমিশনারকে পুনর্নিয়োগ প্রদানের লক্ষে অবশ্য সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। অতীতের অনেকগুলো সংবিধান সংশোধনই রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তির স্বার্থে করা হয়েছে, যার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রে সুখকর ছিলো না। আমরা কি আবারও সে পথে হাটব? তিনজন ব্যক্তির জন্য সংবিধান সংশোধন করব? শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের অনেকেই এমন প্রচেষ্টার সঙ্গে একমত হবেন না। এছাড়াও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যগণও নতুন বিতর্কের মুখোমুখি হবেন, যা তাঁদের দায়িত্ব পালনে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে অনেকের বিশ্বাস।

উপসংহার

নীতিগতভাবে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করলেও, যেভাবে গত ২১ জানুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রপতির পরামর্শকে উপেক্ষা করে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে তা নিয়ে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। যেহেতু রাষ্ট্রপতির তাঁর প্রস্তাবে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের বিধান রেখেছিলেন, তাই অন্তত প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী দুইজন নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে অনুসন্ধান কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেত। আরও অন্তর্ভুক্ত করা যেত গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিকে, যার ফলে কমিটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত বলে অনেকে মনে করেন।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানকে অনুসন্ধান কমিটিতে যুক্ত করতে সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু সরকার তাঁকে বাদ দিয়েছে। তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্যই তা করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা, যা নবগঠিত কমিটি সম্পর্কে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও বিদায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে, যিনি তাঁর মেয়াদকালে নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করাও অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। ফলে একটি ভাল উদ্যোগকেও যে বিতর্কিত করা যায়, সরকারের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন তার একটি বড় প্রমাণ।

সরকারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত এবং অতীতের অনুসন্ধান কমিটিগুলোর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ নবগঠিত কমিটির সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। চ্যালেঞ্জটি হলো একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা। আশাকির কমিটি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করবে। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কমিটি এ চ্যালেঞ্জ উত্তীর্ণ হতে পারবে।

পশ্চিমের অনেক দেশেই 'সানশাইন ল' রয়েছে। এ আইনের বিধানুযায়ী, সীমিত কিছু বিষয় ছাড়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব সিদ্ধান্তই প্রকাশ্য সভায় গ্রহণ করতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। তাই আমরা প্রস্তাব করছি অনুসন্ধান কমিটির সভাগুলো উন্মুক্ত করার জন্য, যাতে রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এগুলোতে উপস্থিত থাকতে পারেন। পশ্চিমের অনেক দেশেই 'সানশাইন ল' রয়েছে। এ আইনের বিধানুযায়ী, সীমিত কিছু বিষয় ছাড়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব সিদ্ধান্তই প্রকাশ্য সভায় গ্রহণ করতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা। তাই আমরা প্রস্তাব করছি অনুসন্ধান কমিটির সভাগুলো উন্মুক্ত করার জন্য, যাতে রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আরেকটি পন্থা হতে পারে অনুসন্ধান কমিটির বিবেচনাধীন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশকৃত নামগুলো প্রকাশ করা। তা করা হলে বিবেচনাধীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি কারো কোনো গুরুতর অভিযোগ থাকে, তা প্রকাশ পাবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগের পথ সুগম হবে। এ লক্ষ্যে কমিটি পাবলিক হিয়ারিংয়ের বা গণ শুনানিরও ব্যবস্থা করতে পারে। কমিটির যেহেতু নিজ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের এখতিয়ার রয়েছে, তাই কমিটি চাইলেই তার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে।

পরিশেষে, আমরা আশাকরি যে কমিটি তার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্বের কথা এবং দায়িত্বটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে পালন না করার পরিণতি সম্পর্কে সজাগ থাকবে। আমরা জানি যে, আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির কারণে কমিটি যাঁদের নামই প্রস্তাব করুক না কেন, বিরোধী দল বিনা দ্বিধায় এবং মুহূর্ত ক্ষেপন না করেই তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। তবে দল নিরপেক্ষ নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের কাছে যদি অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনে নিয়োগপ্রাপ্তরা বিতর্কিত বলে প্রতীয়মান হন, তাহলে আমরা এক ভয়াবহ সঙ্কটের দিকে ধাবিত হতে পারি, যা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না।